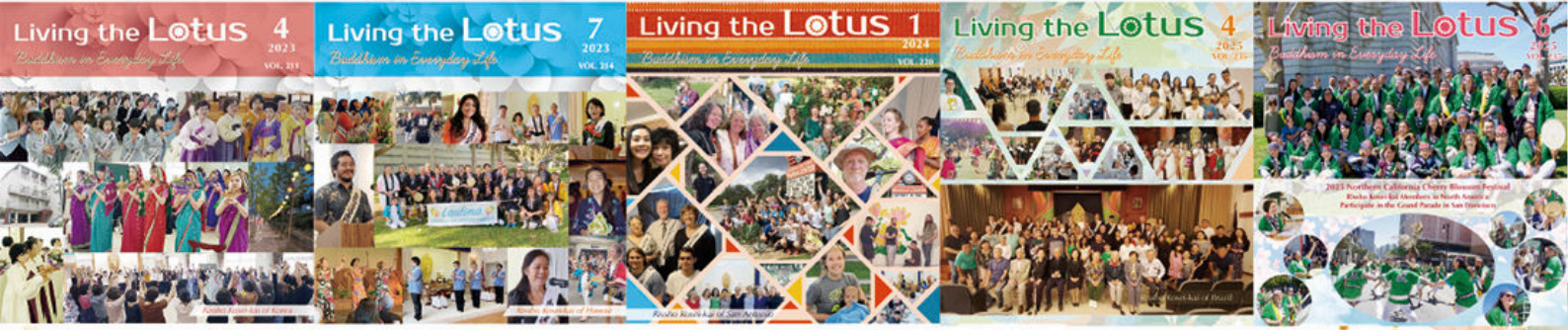


Living the Lotus 10

Buddhism in Everyday Life

2026
VOL. 253



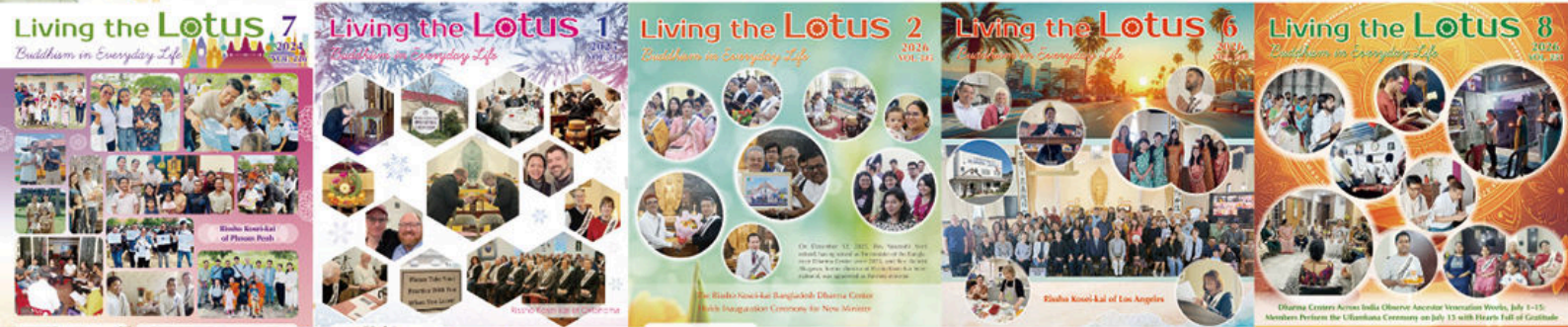
প্রতি মাসে ‘Living the Lotus’ আগ্রহভরে পাঠ করার জন্য আপনাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ। আপনাদের ভালোবাসা ও সহযোগিতায় এই মাসে আমাদের প্রিয় পত্রিকাটি প্রকাশনার ২১তম বর্ষে পদার্পণ করছে। বিভিন্নভাবে যারা সমর্থন ও সহযোগিতা করে আসছেন, তাদের প্রত্যেকের প্রতি জানাই আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

সম্প্রতি রিসসো কোসেই-কাই এর ইংরেজি ওয়েবসাইটটি নতুনভাবে সাজানো ও উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে, এতদিন PDF নিউজলেটার আকারে প্রকাশিত হয়ে আসা ‘Living the Lotus’ আগামী নভেম্বর মাস থেকে নতুন রূপে একটি ওয়েব ম্যাগাজিন হিসেবে প্রকাশিত হবে।

এই মাসের সংখ্যাটিই হবে PDF সংস্করণের সর্বশেষ সংখ্যা। তবে ‘Living the Lotus’-এর প্রকাশনা অব্যাহত থাকবে। ভবিষ্যতেও এতে প্রেসিডেন্টের ধর্মবাণী-সহ দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধধর্মের শিক্ষাকে কাজে লাগানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের উপযোগী ও অনুপ্রেরণামূলক প্রবন্ধ আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে।

আগামী দিনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ‘Living the Lotus’-এর নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় প্রবেশ করে আগের মতোই এই পত্রিকার পাঠ উপভোগ করবেন, সেই প্রত্যাশা ও আন্তরিক অনুরোধ রইল।

আপনাদের অব্যাহত ভালোবাসা ও সহযোগিতার জন্য আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।



Living the Lotus
Vol. 253 (October 2026)

Senior Editor: Rev. Takashi Maeda
Editor: Sachi Mikawa
Copy Editor: Kanchan Barua, Protik Barua

Living the Lotus is published monthly
By Rishso Kosei-kai International,
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan.
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

রিসসো কোসেই-কাই ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিয়ো নিওয়ানো এবং সহ-প্রতিষ্ঠাতা মিয়োকো নাগানুমা। এই সংস্থা হলো সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রকে পবিত্র মূল ধর্মগ্রন্থ হিসেবে নেয়া একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থা। পরিবার, কর্মস্থল তথা সমাজের প্রতি ক্ষেত্রে ধর্মানুশীলনের শান্তিকামি মানুষের সম্মিলনের স্থান হলো এই রিসসো কোসেই-কাই। বর্তমানে, সম্মানিত প্রেসিডেন্ট নিচিকো নিওয়ানোর নেতৃত্বে, অনুসারীরা সকলে একজন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হিসেবে, বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার ও প্রসারে আত্ম-নিবেদিত। নানা ধর্মীয় সংস্থা থেকে শুরু করে, সমাজের নানান্তরের মানুষের সাথে হাতে-হাত রেখে, বিশ্বব্যাপি নানা শান্তিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে যাচ্ছে এই সংস্থা।

লিভিং দ্যা লোটার (সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের আদর্শ নিয়ে বাঁচা~দৈনন্দিন জীবনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রয়োগ) শিরোনামের মধ্যে দৈনন্দিন জীবনে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষাকে প্রতিপালন করে, কর্তৃত্ব মাটিতে প্রস্তুত পদ্ম ফুলের ন্যায় উন্নত মূল্যবান জীবনের অধিকারী হওয়ার কামনা সন্নিবেশিত। এই সাময়িকীর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর কাছে দৈনন্দিন জীবনোপযোগী তথাগত বুদ্ধের দেশিত নানা গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ইন্টারনেট সহযোগে সকলের মাঝে ছড়িয়ে দিতে আমরা বদ্ধপরিকর।

জন্ম ও মৃত্যু বিস্ময়কর সত্যের অংশ

রেভারেন্ড নিচিকো নিওয়ানো
প্রেসিডেন্ট, রিস্সো কোসেই-কাই।



মৃত্যুকে অতিক্রম করা

“বৌদ্ধ সাধনার সবচেয়ে অপরিহার্য বিষয় হলো—জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকে অতিক্রম করা।”—এটি প্রতিষ্ঠাতার ধর্মোপদেশের একটি অংশ, যেখানে বৌদ্ধধর্মের জীবনদর্শন এবং মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করেছেন। ‘মৃত্যু’ হলো মানব জীবনের সবচেয়ে বড় ও গভীরতম একটি ঘটনা। তাই—“মৃত্যুর পর কী হবে?” “আমি মৃত্যুকে ভয় পাই।” “আমি মরতে চাই না।”—এই ধরনের উদ্বেগ, ভয় ও দুঃখকে অতিক্রম করা, অর্থাৎ মৃত্যুভীতিকে জয় করে তার ঊর্ধ্বে উঠতে পারা, নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ সাধনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। মৃত্যুকে ঘিরে থাকা ভয় ও দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করে অন্তরে শান্তি ও নিশ্চয়তা লাভ করা, একই সঙ্গে নিজের এবং অন্যের সুখ ও কল্যাণ কামনা করে নিজের মন ও শরীরকে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত করে তোলা—এটাই বৌদ্ধ সাধনার প্রকৃত সারমর্ম।

বৌদ্ধ সাধনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—‘জীবন ও মৃত্যু’কে আমরা কীভাবে দেখি এবং কীভাবে গ্রহণ করি। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আমি বলেছি—মৃত্যু হলো ‘মহাজীবন’-এর স্বদেশে ফিরে যাওয়া। জীবনের প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী অধ্যাপক হারুও সাজি-এর বক্তব্য তুলে ধরেছিলাম, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বলা যায়, আমাদের জীবন মহাবিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো পৃথক সত্তা নয়; বরং আমাদের জীবন মহাবিশ্বের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই অত্যন্ত জোর দিয়ে বলা যায়—“আমরা প্রতিদিনই অনন্ত জীবন যাপন করছি।”

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ মহাজাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ‘জীবন’-কে দেখলে, আমরা প্রত্যেকেই এমন এক ‘অনন্ত জীবন’ যাপন করছি, যার সূচনা মহাবিশ্বের সৃষ্টির সুদূর অতীতে এবং যার প্রবাহ ভবিষ্যতের অনন্ত সময় পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জীবনকে গ্রহণ করতে পারলে, মৃত্যুকে ঘিরে উদ্বেগ, দৃষ্টিভঙ্গি ও অজানা ভবিষ্যতের ভয়ও ধীরে ধীরে প্রশমিত হতে থাকে।

বাস্তব জীবনে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েও, বুদ্ধের শাস্ত্র জীবন সম্পর্কে বর্ণিত সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের প্রতি গভীর বিশ্বাসের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যুর দুঃখকে অতিক্রম করা সম্ভব বলে মনে করেন জাপানের বিশিষ্ট কবি কেনজি মিয়াজাওয়া। একটি কবিতায় কেনজি লিখেছেন—“আমি অচিরেই

মৃত্যু বরণ করব—আজ না হয় কাল।” নিজের অনুভূতি তিনি কবিতায় এভাবে প্রকাশ করেছেন যে—“আমি কি মরে শূন্যতায় ফিরে যাব? নাকি আবার নিজেকে অনুভব করব? ...সেই আদি সত্য-ধর্মের নাম—বিশ্বয়কর সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র।” মৃত্যুর পর আমরা মহাবিশ্বের সেই ‘মহাজীবন’-এর কাছে ফিরে যাই এবং পরবর্তীতে আবার নতুন জীবন লাভ করি। এটাই সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে প্রকাশিত জীবনদর্শন।

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষার আলোকে অনন্ত জীবনের বিষয় উপলব্ধি করে, অসুস্থতা ও রোগের যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হওয়া কেনজি আরও লিখেছিলেন—“জীবনও হলো সেই বিশ্বয়কর বিধানের অংশ, মৃত্যুও সেই বিশ্বয়কর বিধানের অংশ।” অর্থাৎ, অসুস্থতার মধ্য দিয়ে যাওয়া জীবন; আর নিজের দিকে এগিয়ে আসা মৃত্যু উভয়কেই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

চিরন্তন জীবনকে ধারণ করে পথচলা

মিয়াজাওয়া কেনজি যখন “১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারি” কবিতাটি রচনা করেন, মৃত্যুর প্রায় চার বছর আগে, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তেত্রিশ বছর। এত অল্প বয়সে জীবন ও মৃত্যুবোধের এমন গভীর উপলব্ধি সত্যিই বিরল। নিঃসন্দেহে, সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষা ও বিশ্বাসই তাঁকে এই দৃষ্টিভঙ্গির ওপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে সহায়তা করেছিল বলে মনে হয়।

মৃত্যুর পর আমরা কোথায় যাব, কী হবে—তা কেউ জানে না। তবুও আমরা বর্তমানে এবং, মৃত্যুর পরও চিরন্তন জীবনের ধারাতেই অব্যাহত থাকাবো জানলে, অন্তরে এক গভীর প্রশান্তি নেমে আসে। সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে মিয়াজাওয়া কেনজি যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন, একই বিশ্বাসের পথে চলা আমরাও সেই আনন্দের স্বাদ লাভ করতে পারি—এ কথা কি আমরা বলতে পারি না?

আমিও একসময় বলেছিলাম, “প্রতিষ্ঠাতার শান্তভাবে জীবনের উৎসভূমিতে ফিরে যাওয়ার দৃশ্য নিজের চোখে দেখে আমার মনে হয়েছিল—‘আহা, আমিও যদি তাঁর মতো শান্তভাবে মৃত্যুকে বরণ করতে পারতাম!’ সেই অনুভূতি আজও আমার মধ্যে অপরিবর্তিত রয়েছে। আমি মনে করি, এটি আমাদের পূর্বসূরিদের জীবন ও জীবনের সত্য সম্পর্কে দীর্ঘদিনের গভীর সাধনা, অধ্যয়ন এবং ধর্মবিশ্বাসের আশীর্বাদেরই ফল।

তবে ‘মৃত্যু’ এমন এক সত্য, যা কারও জন্যই ব্যতিক্রম নয়। নিজের হোক কিংবা প্রিয়জনের—মৃত্যুকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়ে তাতে অন্তরের পরিপূর্ণ তৃপ্তি পাওয়া হয়তো সবসময় সম্ভব নয়। আর ঠিক সেই কারণেই “জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকে অতিক্রম করা” মানবজীবনের অন্যতম বৃহৎ সাধনার বিষয় হয়ে ওঠে। আবার, যেহেতু একদিন প্রত্যেককেই মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হবে, তাই এই মুহূর্তে জীবিত থাকার আনন্দকে গভীরভাবে অনুভব করা এবং সেই ‘বর্তমান মুহূর্তটিকে’ বহু মানুষের সঙ্গে সম্প্রীতি ও সৌহার্দের মধ্য দিয়ে একসঙ্গে বেঁচে থাকা—এর চেয়ে বড় সুখ আর কী হতে পারে?

তাহলে—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সূচনালগ্ন থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়ে আসা ‘চিরন্তন জীবনের’ ধারার মধ্যে আমরা কেন ‘জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু’ এর দুঃখকে সঙ্গে নিয়ে এই পৃথিবীতে জীবনযাপন করছি? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আবার অন্য এক সময়ে নতুন করে ভাবতে চাই।

‘কোসেই’ অক্টোবর ২০২৬ইং।



অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বকে আদর্শ হিসেবে ধারণ করে, করুণাপূর্ণ হৃদয়ে এগিয়ে চলা

প্রিয়রঞ্জন বড়ুয়া, রিসসো কোসেই-কাই বাংলাদেশ।

আপনি কখন এবং কীভাবে রিসসো কোসেই-কাই-এর সঙ্গে যুক্ত হলেন?

আমি থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী একটি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছি এবং বেড়ে উঠেছি। তদুপরি, আমার দুই দাদু থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের খ্যাতিমান ভিক্ষু ছিলেন। এমন একটি ধর্মীয় পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে ছোটবেলা থেকেই বুদ্ধের প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও অকৃত্রিম বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল। পড়াশোনা শেষ করার পর আমি বাংলাদেশের একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে আমার নিজ শহর চট্টগ্রামে কর্মজীবন শুরু করি। কিন্তু কিছুদিন পর আমাকে চট্টগ্রাম থেকে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার দূরে সিলেটে বদলি করা হয়। সিলেট একটি ইসলামি সংস্কৃতির জন্য সমৃদ্ধ শহর। সেখানে কোনো বৌদ্ধ মন্দির ছিল না। অল্পসংখ্যক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসবাস করতো। ফলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরে যাওয়া এবং বুদ্ধের শিক্ষা শোনার বা জানার সুযোগ আমারও ধীরে ধীরে কমে গেল।

এরপর ২০০০ সালে একদিন আমার বন্ধু বিপ্লব বড়ুয়া এবং আত্মীয় অসীম বড়ুয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁদের কাছ থেকেই প্রথম জানতে পারি যে চট্টগ্রামে রিসসো কোসেই-কাই নামে একটি গৃহী বৌদ্ধ ধর্মীয় সংগঠন রয়েছে। তাঁরা আমাকে তৎকালীন যোগাযোগ কেন্দ্রের প্রধান বিমান কুমার বড়ুয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তাঁরা দুজনের আন্তরিক ও উষ্ণ অনুপ্রেরণায় আমি কর্মস্থল সিলেট থেকে বহু দূরে চট্টগ্রামে বারবার আসতে শুরু করি। প্রতি শুক্রবার অনুষ্ঠিত প্রার্থনাসভা ও হোজায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে থাকি।

থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম এবং রিসসো কোসেই-কাই— উভয়েই বুদ্ধের শিক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। তবে সাধনা ও ধর্মচর্চার পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য রয়েছে। থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে সাধারণত ভিক্ষুরা পালি ভাষায় সূত্রপাঠ ও আবৃত্তি করেন এবং ধর্মদেশনা প্রদান করেন। অন্যদিকে, গৃহী বৌদ্ধ অনুসারীদের ধর্মচর্চা অনেক সময় প্রার্থনা, সূত্রপাঠ, দান ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক আচারকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। এ ছাড়া অনেক সাধারণ ধর্মানুরাগী পালি ভাষা বুঝতে না পারার কারণে বুদ্ধের গভীর শিক্ষা সরাসরি হৃদয়ে ধারণ করা বা দৈনন্দিন জীবনে তা প্রয়োগ করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু রিসসো কোসেই-কাই-এর সদস্যরা নিজেদের মাতৃভাষা বাংলায় একসঙ্গে পুণ্ডরীক সূত্র পাঠ করেন। তাঁরা বুদ্ধের শিক্ষা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করেন, নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন এবং



বাবু প্রিয়রঞ্জন বড়ুয়া

একে অপরের কাছ থেকে শিখতে থাকেন। এই বিষয়টি আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল।

যে বিষয়টি আমাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিল তা হলো—রিসসো কোসেই-কাই-এর সদস্যগণ গৃহী বৌদ্ধ হিসেবে নিজেদের পরিবার ও কর্মজীবনের দায়িত্বকে যথাযথভাবে পালন করার পাশাপাশি, মানুষের সুখ ও সমাজের কল্যাণে বুদ্ধের শিক্ষা অন্যদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন এবং বোধিসত্ত্ব জীবনচর্চা করছেন। এই নতুন ও গভীরভাবে অনুপ্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতা আমার হৃদয়কে নাড়া দিয়েছিল। আমার মনে প্রবলভাবে একটি আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল— “আমিও এই পথেই এগিয়ে যেতে চাই।” সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই পরবর্তীতে আমি রিসসো কোসেই-কাই-এর সদস্য হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি।

তাহলে, ঐ দুই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎই কি আপনার বিশ্বাসজীবনের একটি বড় মোড় হয়ে উঠেছিল? হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাতের ফলেই আমি রিসসো কোসেই-কাই এবং সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষার সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর সেই শিক্ষাকে প্রতিদিনের জীবনে অনুশীলন করার মাধ্যমে আমি বহু পুণ্যফল, আশীর্বাদ ও অন্তরের শক্তি লাভ করেছি।

প্রকৃতপক্ষে, আমি বিশ্বাস করি, ঐ দুই ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ছিল আমার জীবনের এক অমূল্য

সাক্ষাৎকার

শুভ-বন্ধন, যা আমার সামনে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছিল।

আমি যখন রিসসো কোসেই-কাই-এর ধর্মকেন্দ্রে যাওয়া শুরু করি, তখন রেভারেন্ড ইজাওয়া কাজুমাসা (ওইতা ধর্মকেন্দ্রের প্রাক্তন বাঞ্চপ্রধান) মহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। যিনি বহু বছর ধরে বাংলাদেশে সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষার বীজ বপন করে আসছিলেন—জাপান থেকে ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এসেছিলেন তিনি। তাঁর কাছ থেকে তখন আমি অনেক মূল্যবান ও গভীর ধর্মীয় আলোচনা শোনার সুযোগ পাই। বিশেষ করে, রিসসো কোসেই-কাই-এর সদস্যরা কীভাবে অন্য মানুষের সুখ ও কল্যাণের জন্য প্রতিদিন বোধিসত্ত্বের জীবন অনুশীলন করেন, তাঁর এই বক্তব্য আমার হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল। সেই সময় আমি সিলেটে কর্মরত ছিলাম। কিন্তু রিসসো কোসেই-কাই-এর শিক্ষা ও ধর্মচর্চার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়ে প্রতি শুক্রবার সিলেট থেকে চট্টগ্রামে আসতে শুরু করি। দূরত্ব ছিল অনেক, পথও সহজ ছিল না। তবুও সেই দূরত্ব আমার সংকল্পকে থামাতে পারেনি। চট্টগ্রামে এসে আমি সংঘের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একত্রে বন্দনা ও হোজায় অংশগ্রহণ করতাম।

এরপর আমার মনে একটি গভীর আকাঙ্ক্ষা জন্ম নেয়—সিলেটে থাকা আরও অনেক মানুষের কাছে রিসসো কোসেই-কাই-এর এই চমৎকার ও কল্যাণময় শিক্ষা পৌঁছে দিতে হবে। এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমি বন্ধু ও পরিচিতদের আমন্ত্রণ জানাতে শুরু করি এবং তাঁদের নিয়ে বন্দনা ও হোজায় আয়োজন করি। এভাবে ধীরে ধীরে অনেক মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাই।

সবার সহযোগিতা ও আশীর্বাদে শেষ পর্যন্ত ২৫টি পরিবারকে রিসসো কোসেই-কাই-এর ধর্মপথের সঙ্গে যুক্ত করার (মিচিবিকি করা) সৌভাগ্য লাভ করি।

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষা অধ্যয়ন করে কোন বিষয়টি আপনার হৃদয়ে সবচেয়ে গভীরভাবে দাগ কেটেছে?

সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রে মঞ্জুশ্রী, মৈত্রেয়, সদাপরিভূত বোধিসত্ত্ব প্রমুখ অসংখ্য বোধিসত্ত্বের উল্লেখ রয়েছে। এই বোধিসত্ত্বদের প্রত্যেকেই অসাধারণ গুণাবলি ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী। তাঁদের প্রত্যেককেই আমাদের জীবনের আদর্শ দৃষ্টান্ত বলে মনে করি। বিশেষভাবে করুণার প্রতীক অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের প্রতি আমি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছি। তাঁকে আমি জীবনের একটি মহৎ আদর্শ ও লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেছি। সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের ২৫তম অধ্যায়—‘অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের দ্বার সর্বদিকে’ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—‘অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব তেত্রিশটি রূপ ধারণ করে ধর্ম প্রচার করেন।’ এর অর্থ হলো, অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব মানুষের দুঃখ-কষ্ট থেকে তাদের উদ্ধার করার জন্য পরিস্থিতি ও মানুষের প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রূপ ধারণ করেন এবং মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখান। আমিও অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের করুণাময় হৃদয়কে আদর্শ হিসেবে ধারণ করে, অন্যের দুঃখে সাড়া দেওয়া এবং মানুষের সুখ ও কল্যাণের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করার লক্ষ্য নিয়ে, করুণাপূর্ণ হৃদয়ে বোধিসত্ত্বের সাধনায় নিষ্ঠার সঙ্গে এগিয়ে যেতে চাই।

রিসসো কোসেই-কাই-এর কোন শিক্ষাটি আপনি বিশেষভাবে হৃদয়ে ধারণ করেন?

“অন্যকে আগে স্থান দেওয়া”—এই কথাটি আমার খুব প্রিয়। আমি প্রতিদিনের জীবনে এই নীতিকে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি। কারণ, “অন্যকে আগে স্থান দেওয়া”ই পুণ্ডরীক সূত্রের শিক্ষার সারমর্ম; এটি বোধিসত্ত্ব জীবন চর্চার মূল ভিত্তি বলে মনে করি। রিসসো কোসেই-কাই-এ শিক্ষা দেওয়া হয়, ‘বোধিসত্ত্ব হলেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি নিজে জ্ঞানলাভের সাধনার পাশাপাশি, অন্যের সুখ ও কল্যাণের জন্য কাজ করেন। কিন্তু আমাদের চারপাশের বাস্তব সমাজের দিকে তাকালে দেখা যায়, অনেক মানুষই আত্মকেন্দ্রিক জীবনযাপন করেন। বিষয়টি সত্যিই দুঃখজনক। ঠিক এই কারণেই আমি মনে করি,



শুক্রবারের বিশেষ প্রার্থনায় উপস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন বাবু প্রিয়রঞ্জন বড়ুয়া

সাফাংকার

“অন্যকে আগে স্থান দেওয়া”কে জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করা এবং অন্যের সুখ ও কল্যাণের কথা মনে রেখে কাজ করার মধ্যেই আমাদের জীবনের প্রকৃত আনন্দ, সার্থকতা ও বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

রিসসো কোসেই-কাই-এর কোন দিকগুলো আপনার কাছে আকর্ষণীয় মনে হয়?

রিসসো কোসেই-কাই-এর বিভিন্ন অনুশীলনের মধ্যে পূর্বপুরুষ বন্দনা, হোজা (ধর্মবৈঠক) এবং “একবেলা আহার উৎসর্গ” এসব কর্মকাণ্ড আমার কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় মনে হয়। এর কারণ হলো, পূর্বপুরুষ বন্দনার মাধ্যমে আমি বুদ্ধ এবং আমার পূর্বপুরুষদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার সুযোগ পাই। হোজার মাধ্যমে সংঘের সদস্যদের সঙ্গে ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতে, পরস্পরের কাছ থেকে শিখতে এবং নিজেদের জীবন-অভিজ্ঞতা ও ধর্মচর্চার মাধ্যমে অর্জিত পুণ্যফল একে অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারি। এ ছাড়া, “একবেলা আহার উৎসর্গ” কার্যক্রমটিও আমার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে মাসে কয়েকবার স্বেচ্ছায় একবেলা আহার ত্যাগ করে ক্ষুধার অনুভূতি উপলব্ধি করা, একই সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে দারিদ্র্য, অসুস্থতা ও নানা সংকটে দৃষ্টাগ্রস্ত মানুষের মঙ্গল ও সুখের জন্য প্রার্থনা করা এবং তাঁদের সহায়তায় দান করা হয়। আমি বিশ্বাস করি, এটি বৌদ্ধধর্মের “সহানুভূতি, প্রার্থনা ও দান”-এর চেতনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা বোধিসত্ত্ব আচরণের একটি বাস্তব অনুশীলন। একই সঙ্গে, এটি বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও শান্তির চেতনা

জাগিয়ে তোলার একটি অত্যন্ত অর্থবহ সমসাময়িক শান্তি কার্যক্রম বলেও আমি মনে করি।

পরিশেষে, অনুগ্রহ করে আপনার ভবিষ্যৎ ধর্মানুশীলনের লক্ষ্য ও জীবনের স্বপ্ন সম্পর্কে কিছু বলুন।

আমরা প্রতিদিন যে সদস্যদের প্রতিজ্ঞা পাঠ করি, তাতে আমাদের ধর্মানুশীলনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে—“ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করা” এবং “পরিবার, সমাজ, দেশ তথা সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা এবং চিরশান্তির বুদ্ধভূমি বিনির্মাণের জন্য বোধিসত্ত্ব সাধনায় আত্মনিয়োগ করা।” অতএব, ভবিষ্যতেও আমি এই সদস্যদের প্রতিজ্ঞাকে জীবনের পথনির্দেশক হিসেবে গ্রহণ করে প্রতিদিন ধর্মানুশীলন ও নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনা চালিয়ে যেতে চাই। নিজের ব্যক্তিত্বকে আরও পরিশীলিত করার পাশাপাশি, অন্যের সুখ ও কল্যাণের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করাই হবে আমার সাধনার মূল লক্ষ্য। আমার ভবিষ্যৎ স্বপ্নের কথা বলতে গেলে, আর তিন বছর পর আমি অবসর গ্রহণ করব। আমি এই অবসর-পরবর্তী জীবনকে জীবনের সমাপ্তি হিসেবে নয়, বরং দ্বিতীয় জীবনের একটি নতুন সূচনা হিসেবে গ্রহণ করতে চাই। সেই নতুন জীবনে অন্যের সুখ ও কল্যাণের জন্য ধর্মপ্রচার এবং বোধিসত্ত্ব জীবন অনুশীলনে নিজেকে আন্তরিকভাবে উৎসর্গ করতে চাই।

আমার একান্ত কামনা, জীবনের এই দ্বিতীয় অধ্যায়টি যেন আরও অর্থবহ, পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে এবং অন্যের সুখে নিজের সুখ খুঁজে পাওয়ার মধ্য দিয়ে একটি সার্থক জীবন যাপন করতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।



বাংলাদেশ ধর্মকেন্দ্রের হোজায় অংশগ্রহণ করছেন বাবু প্রিয়রঞ্জন বড়ুয়া (বিপরীত দিক থেকে বাম থেকে দ্বিতীয়)।



সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র ও চতুরার্যসত্যের শিক্ষা

ডঃ ডমিনিক স্কারাঞ্জেলো
উপদেষ্টা, রিস্সো কোসেই-কাই আন্তর্জাতিক বিভাগ।



সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্রের 'তথাগতের দৈবশক্তি অধ্যায়'-এ উল্লিখিত 'ধর্মানুশীলনের উপযুক্ত ক্ষেত্র' এমন এক মহৎ শিক্ষা, যা আমাদের নীরবে অনুপ্রাণিত করে যেন আমরা পরিবার, কর্মক্ষেত্র, বিদ্যালয়সহ দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্থানকেই সাধনা ও ধর্মচর্চার ক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করি এবং সেখানে বুদ্ধের শিক্ষাকে বাস্তবে অনুশীলন করি।

দুঃখমুক্তির উপায় আর্ষসত্যের অনুশীলন

গত মাসে আমরা চার আর্ষসত্যের দ্বিতীয় সত্য দুঃখ সমুদয় আর্ষসত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। এই মাসে আমরা দুঃখের নিরোধ বা অবসানের উপায় নির্দেশকারী সত্য— দুঃখমুক্তির উপায় আর্ষসত্য নিয়ে চিন্তা করতে চাই।

সাধারণত চার আর্ষসত্যের শেষ সত্য হিসেবে দুঃখ নিরোধ আর্ষসত্যকে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু একটি বিশেষ কারণে, এই ধারাবাহিক আলোচনার তৃতীয় পর্বে আমরা দুঃখ নিরোধের উপায় আর্ষসত্যকে বেছে নিয়েছি। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, যখন আমরা আমাদের উদ্বেগ ও দুঃখ-কষ্টের কারণ বুঝতে শুরু করি (সমুদয় আর্ষসত্য), তখন পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—সেই দুঃখ থেকে নিজেদের মুক্ত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং কোন কোন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, তা জানা। এটাই দুঃখ নিরোধের উপায় আর্ষসত্যের মূল তাৎপর্য।

গত মাসে দুঃখের একটি সহজবোধ্য উদাহরণ হিসেবে, আমার যানজটে আটকে পড়ার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছিলাম। সেখানে, কোনো কিছু নিজের ইচ্ছা বা প্রত্যাশা অনুযায়ী না ঘটলে যে দুঃখের জন্ম হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। এরপর দুঃখ সমুদয় আর্ষসত্যের অনুশীলনের মাধ্যমে আমি নিজের দুঃখের পেছনে কীভাবে কারণ ও ফলের ধারাবাহিক সম্পর্ক কাজ করেছিল, তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার চেষ্টা করেছি।

দুঃখ থেকে মুক্ত হতে হলে আমার করণীয় হলো বুদ্ধের শিক্ষাকে জীবনে অনুশীলন করা। দুঃখের কারণ ও তার কার্যকারণ-সম্পর্ক যেমন বহুবিধ, তেমনি দুঃখমুক্তির উপায় আর্ষসত্যের অনুশীলনের পথও একরকম নয়। তবে এই মুহূর্তে আমাদের পক্ষে প্রথম যে কাজটি করা সম্ভব, তা হলো—অন্যের ওপর ক্রোধ পোষণ করার মতো আচরণ থেকে বিরত থাকা। পুণ্ডরীক সূত্রের তিনটি সূত্রের অন্যতম অমিতার্থ সূত্রে এই বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে—“ক্রোধপ্রবণ লোকের মনে সহিষ্ণুতার চেতনা জাগ্রত করা।” আমরা যখন আবেগের বশবর্তী হয়ে পড়ি, তখন যদি নিজের মনের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হতে পারি, তাহলে ক্রোধের বিস্ফোরণ অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

একইভাবে, ক্রোধ বা বিরক্তিকে বাইরে প্রকাশ না করে সংযত রাখতে পারলে অন্যের সঙ্গে সংঘাত এড়ানো যায়। ফলে নিজের এবং আশপাশের মানুষের দুঃখ-কষ্টের কারণ হওয়া থেকেও আমরা বিরত থাকতে পারি।

কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিতে দেখলে, ক্রোধের অনুভূতির মুখোমুখি না হয়ে কেবল সেটিকে দমন করে চললে সেই আবেগ বরং আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। একসময় তা আরও তীব্র বিস্ফোরণের রূপ নিতে পারে। অর্থাৎ, এ ধরনের আত্মসংযম কার্যকর এবং কোনো কোনো পরিস্থিতিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও, তা মূলত জরুরি পরিস্থিতিতে গ্রহণ করা একটি সাময়িক প্রতিকার মাত্র। একে প্রকৃত অর্থে বোধিসত্ত্বের “ক্ষান্তি” বা সহিষ্ণুতা বলা যায় না। প্রতিষ্ঠাতা নিক্কিও নিওয়ানো বলেছেন—“কেউ যদি অন্যের অত্যাচার বা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের সম্মুখীন হয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে তা সহ্য করে, জানবে যে সে নব দীক্ষিত। কিন্তু যারা সিদ্ধিলাভ করেছে, শত কষ্টের মধ্যেও তাদের মন থাকে শান্ত।” (পুণ্ডরীক সূত্রের সরল ব্যাখ্যা, পৃষ্ঠা ১৭০)

পুণ্ডরীক সূত্রের দশম অধ্যায়, “ধর্মপ্রচারক অধ্যায়ে” বলা হয়েছে যে, প্রকৃত ক্ষান্তি বা সহিষ্ণুতার সঙ্গে দুটি শর্ত জড়িত। প্রথমত, সকল মানুষের প্রতি করুণাপূর্ণ হৃদয়ের অধিকারী হওয়া। দ্বিতীয়ত, সবকিছুকে সমান দৃষ্টিতে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা। যদি আমি নিজের করুণার পরিধি প্রসারিত করতে পারি এবং মানুষকে সমতার দৃষ্টিতে দেখতে শিখি, তাহলে যানজটে আটকে পড়ার মতো কিংবা এ ধরনের অন্য কোনো অসুবিধাজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হলেও আশপাশের মানুষকে শত্রু হিসেবে দেখব না। বরং স্বাভাবিকভাবেই অনুভব করতে পারব—“এই মানুষগুলোও তো আমার মতোই সমস্যায় পড়েছেন, তাঁরাও কষ্ট পাচ্ছেন।” এই উপলব্ধি থেকেই অন্যের অনুভূতির প্রতি সহমর্মিতা জন্ম নেয়।

তাহলে করুণাপূর্ণ হৃদয় ও সমতার দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে আমাদের কী ধরনের সাধনা করা প্রয়োজন? এর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো—পুণ্ডরীক সূত্রের তিনটি সূত্রের সমাপনী সূত্র বুদ্ধভাষিত সমন্তভদ্র বোধিসত্ত্বের তপস্যাবিধি সূত্র (অনুতাপের সূত্র)-এ বর্ণিত শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগ করা। সেখানে বলা হয়েছে—“সকল

মানুষকে এমনভাবে দেখো, যেন তাঁরা বুদ্ধ; আর সকল জীবের প্রতি এমন মনোভাব পোষণ করো, যেন তাঁরা তোমার পিতা-মাতা।" অর্থাৎ, প্রত্যেক মানুষকে বুদ্ধের মতো শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখা এবং সকল প্রাণীকে নিজের পিতা-মাতার মতো মনে করা—এটাই করুণার মন বিকাশের একটি মৌলিক সাধনা। তাছাড়া, প্রতিদিনের সূত্রপাঠ শেষে আমরা যখন পুণ্য উৎসর্গ করি, তখন সেই প্রার্থনার শেষে কোনো দুঃখ-কষ্টে থাকা পরিচিত ব্যক্তির নাম উচ্চারণ করে তাঁর সুখ ও কল্যাণ কামনা করা এবং তাঁর দুঃখের অবসান প্রার্থনা করাও করুণার মন গড়ে তোলার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুশীলন। আরও একটি উপায় হলো, নিজের প্রার্থনাকে বাস্তব কাজের মধ্যে রূপ দেওয়া। অন্যের উপকারে আসে এমন কাজ করা—অর্থাৎ সাধারণভাবে যাকে দান বা দানশীলতার অনুশীলন বলা হয়—তাও অন্যের সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি গড়ে তোলে এবং করুণা ও সমদৃষ্টির বিকাশে সহায়তা করে।

এই সমস্ত অনুশীলনের উদ্দেশ্য হলো বোধিসত্ত্বের পথে এগিয়ে চলা। ক্রোধ প্রশমিত করার জন্য এগুলো প্রয়োজনীয় সাধনা। তবে ক্রোধকে সম্পূর্ণ নির্মূল করার বিষয়টিকেই একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে আঁকড়ে ধরে থাকা ঠিক নয়। কারণ, ক্রোধকে দূর করার জন্য অতিরিক্তভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়লে মন ক্রোধের প্রতি প্রতিক্রিয়ার এক অবিরাম চক্রের মধ্যে আটকে যেতে পারে।

শ্রদ্ধেয় প্রতিষ্ঠাতা এ বিষয়ে সতর্ক করে বলেছেন—“যতক্ষণ মনে মনে ভাবতে থাকি, ‘ক্লেশ থেকে মুক্ত হব, ক্লেশ থেকে মুক্ত হব’, ততক্ষণ মন ক্লেশ নামক ধারণার সঙ্গেই আটকে থাকে। ফলে কোনোভাবেই সম্পূর্ণভাবে তা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব হয় না।”

এ ছাড়া, নিজের ভেতরের ক্রোধকে যদি কেবল “দূর করতে হবে এমন শত্রু” হিসেবে দেখি, তাহলে সেই ক্রোধের গভীরে যে করুণার বীজ লুকিয়ে আছে, তা আর দেখতে পাই না। অর্থাৎ, “নরকলোকের” মধ্যেও যে “বোধিসত্ত্বজগৎ” বিদ্যমান, সেই সত্য উপলব্ধি করার সুযোগ হারিয়ে ফেলি। আমার নিজের ক্রোধও ছিল যথেষ্ট অপরিণত ও শিশুসুলভ। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারি, সেই ক্রোধের মধ্যেও নিজের প্রতি এক ধরনের করুণার অনুভূতি কাজ করছিল। শৈশবে নির্ধারিত সময়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারার কারণে যে কষ্টকর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতা আর কখনো ফিরে আসুক—আমি তা চাইনি। সেই পুরোনো কষ্টের পুনরাবৃত্তি ঠেকানোর একটি গভীর ও আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা আমার ক্রোধের অন্তরালে লুকিয়ে ছিল। অর্থাৎ, আমার ক্রোধের গভীরে ছিল এমন এক আকুল প্রার্থনা—“আমি আর কখনো সেই কষ্ট পেতে চাই না।” যখন মনের গভীরে এমন কোনো আকাঙ্ক্ষা বা প্রার্থনা থাকে, তখন সেটিকে সচেতনভাবে উপলব্ধি করা এবং আন্তরিকভাবে গ্রহণ করার মাধ্যমে ক্রোধের মূলে থাকা মানসিক ক্ষতকে নিরাময় করা সম্ভব হয়।

আরও এক ধাপ এগিয়ে আমি উপলব্ধি করেছি, শৈশবে সময়মতো কোনো কাজ করতে না পারার মতো কারণে যেসব প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আমাকে কঠোরভাবে

বকাঝকা করেছিলেন, তাঁদের ক্রোধের মধ্যেও করুণার উপস্থিতি ছিল। তখন যদি আমি তাঁদের ক্রোধের অন্তরালে থাকা সেই করুণাকে উপলব্ধি করতে পারতাম, তাহলে হয়তো বিষয়টিকে আরও গভীরভাবে বুঝতে পারতাম। সেই প্রাপ্তবয়স্ক মানুষগুলোর নিজেদের জীবনেও দুঃখ-কষ্ট ছিল। সেই দুঃখের কারণে তাঁরা হয়তো আমাকে সঠিকভাবে পথ দেখাতে পারেননি কিংবা তাঁদের ভালোবাসা প্রকাশের উপযুক্ত পদ্ধতি খুঁজে পাননি। কিন্তু তাঁদের অন্তরের গভীরে আমার সুখ ও কল্যাণ কামনার অনুভূতিও ছিল। বৌদ্ধধর্মের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই সত্য উপলব্ধি করাই হলো “ক্ষমা”।

দুঃখ মুক্তির উপায় আর্ষসত্যের অনুশীলন বলতে বোঝায়, দুঃখের কারণগুলোর মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন সাধনাকে একটি সুসংবদ্ধ পদ্ধতিতে জীবনে প্রয়োগ করা। দৈনন্দিন জীবনে নিজের মনের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারলে, ক্রোধ বিস্ফোরিত হওয়ার মুহূর্তেই আমরা তাকে সংযত করতে পারি। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকলে চলবে না। সাময়িক প্রতিকারের গণ্ডি পেরিয়ে আমাদের করুণার মন ও সমদৃষ্টির পরিধি প্রসারিত করতে হবে। ধীরে ধীরে ক্রোধকে অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজনীয় সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। এভাবে অনুশীলন করতে করতে একসময় নিজের ক্রোধকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং সেই ক্রোধের মধ্যেই বোধিসত্ত্বের মহাকামনা বা কল্যাণকামী প্রার্থনা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়। তখন ক্রোধকে কেবল দমন করার মতো কোনো শত্রু হিসেবে না দেখে, বরং নিজেকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্যকারী এক শুভমিত্র—“সৎকল্যাণমিত্র” হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। এমনকি নিজের অন্তরের ক্রোধকেও নিজের ভেতরের “দেবদত্ত” হিসেবে দেখতে শিখি। এই দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ক্রোধকে দমন করা কিংবা শত্রু ভেবে তার সঙ্গে লড়াই করার পরিবর্তে, ক্রোধের অন্তর্নিহিত করুণা ও বুদ্ধপ্রকৃতিকে জাগ্রত করা সম্ভব হয়। ফলে ক্রোধ নিজেই ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হতে থাকে।

আগামী পর্বে আমরা “এখানে ও এখন ধর্মের অনুশীলন”—এই দৃষ্টিকোণ থেকে চার আর্ষসত্যের তৃতীয় সত্য দুঃখ নিরোধ আর্ষসত্য নিয়ে আলোচনা করব। দুঃখের অবসান ঘটলে যে শান্ত, প্রশান্ত ও মুক্তির অবস্থা উপলব্ধি হয়, সেই নিরোধসত্যের তাৎপর্য অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে আমরা এই ধারাবাহিক আলোচনা সমাপ্ত করতে চাই।





বুদ্ধের মহান অভিপ্রায়কে ধারণ করে বাঁচা

বুদ্ধের মতো হতে চাই

রেভারেন্ড নিক্কিও নিওয়ানো
প্রতিষ্ঠাতা, রিস্সো কোসেই-কাই।



আমরা সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র-এর শিক্ষা বিশ্বাস ও গ্রহণ করে ধীরে ধীরে হলেও বোধিসত্ত্বচর্চার সুযোগ পাচ্ছি। এর অর্থ—আমরা এক ধাপ এক ধাপ করে বুদ্ধত্বের পথে, অর্থাৎ বুদ্ধ হওয়ার মহান অভিযাত্রায় অগ্রসর হচ্ছি।

নিশ্চয়ই “বুদ্ধ হওয়া” সহজ নয়। তবে একে অতিরিক্ত দুঃসহ মনে না করে, বরং জীবনে প্রয়োগযোগ্যভাবে গ্রহণ করাই অধিকতর ফলপ্রসূ। “বুদ্ধ” শব্দের অর্থ—“জাগ্রত ব্যক্তি”। অর্থাৎ, যিনি জগতের সমস্ত বিষয়কে তার প্রকৃত স্বরূপে উপলব্ধি করতে পারেন এবং নিজের মনের প্রতিটি অবস্থাকে নিখুঁত স্বচ্ছতায় অবলোকন করতে সক্ষম—তিনিই বুদ্ধ।

অন্যদিকে, আমরা সাধারণ মানুষ জগতকে তার প্রকৃত রূপে দেখতে পারি না, আবার নিজের মনকেও সর্বদা সঠিকভাবে স্থির রাখতে পারি না। তাই তথাগত বুদ্ধের শিক্ষা অনুসরণ করে “জাগ্রত ব্যক্তি” হয়ে ওঠার প্রচেষ্টাই হলো বোধিসত্ত্বচর্চা, এবং সেটিই বুদ্ধের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রকৃত উপায়।

এই প্রসঙ্গে, সদ্ধর্ম পুণ্ডরীক সূত্র-এর “উপায়-কৌশল্য অধ্যায়”-এ বুদ্ধ ঘোষণা করেছেন—“আমি আদিত্যে একটি মহান সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম—সকল প্রাণীকে আমার সমকক্ষ করে তুলব, যেন তাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য না থাকে।” অর্থাৎ, তিনি প্রত্যাশা করেন—সমস্ত মানুষ যেন তাঁর মতোই কলুষমুক্ত প্রজ্ঞা ও অপরিমেয় করুণায় পরিপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হতে পারে। এখন প্রশ্ন হলো—আমরা এই মহান ব্রতকে কীভাবে গ্রহণ করব?

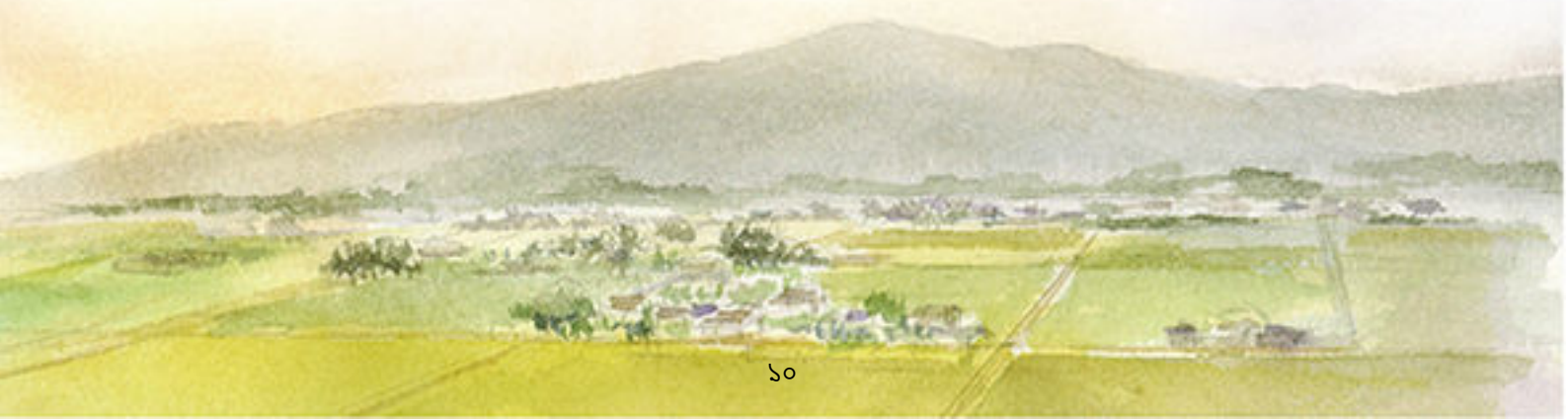
অনেকেই হয়তো মনে করতে পারেন—“এটা তো অসম্ভব; আমরা কখনোই বুদ্ধের মতো হতে পারব না।” কিন্তু অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবলে দেখা যায়—যেহেতু বুদ্ধ নিজেই আমাদের এই সম্ভাবনার নিশ্চয়তা দিয়েছেন এবং সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, তাই আমরাও অবশ্যই “জাগ্রত ব্যক্তি” হওয়ার পথে অগ্রসর হতে পারি। এই বিশ্বাস, আশা ও কৃতজ্ঞতার সাথে জীবনযাপন করলে জীবন সহজতর, সুশৃঙ্খল ও আনন্দময় হয়ে ওঠে।

আমরা প্রায়ই মনে করি—এই জীবনই সবকিছু; তাই ক্ষণস্থায়ী সুখের পিছনে ছুটে চলি। কিন্তু বাস্তবতা হলো—যতই ভীত সম্পদ থাকুক না কেন, কেউই জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর দুঃখ থেকে মুক্ত নয়। তদুপরি, প্রিয়জন থেকে বিচ্ছেদের বেদনা এবং অপছন্দের বিষয়ের সম্মুখীন হওয়ার যন্ত্রণা আমাদের জীবনকে নানাভাবে স্পর্শ করে।

আরও গভীর সত্য হলো—আমাদের জীবন কেবল এই এক জন্মেই সীমাবদ্ধ নয়। তাই এই জীবনে যদি আমরা সামান্য হলেও বোধিসত্ত্বচর্চা করতে পারি, তবে তার শুভফল পরবর্তী জন্মেও প্রভাব ফেলবে। ধীরে ধীরে আমরা স্বার্থপরতার সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে অন্যের কল্যাণ চিন্তা করতে সক্ষম এমন এক মহৎ হৃদয়ের দিকে অগ্রসর হব।

অতএব, বুদ্ধ যখন এই মহান সংকল্প ব্যক্ত করেন যে—“সকল প্রাণীকে আমার সমকক্ষ করে তুলব,” তখন এর মাধ্যমে তিনি এটাও নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, প্রকৃতপক্ষে আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই বোধিজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা বিদ্যমান।

নিওয়ালো নিক্কিও বাণী সংগ্রহ ১, ‘বোধিবীজকে জাগ্রত করা’ পৃ. ১০৮-১১০



চার দুঃখকে অতিক্রম করে, বর্তমানকে নিয়ে বাঁচা

রেভারেন্ড তাকাশি মায়েদা
পরিচালক, রিসসো কোসেই-কাই আন্তর্জাতিক মিশন।

সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বৌদ্ধধর্ম আমাদের শিক্ষা দেয় যে, মানবজীবনে চার প্রকার দুঃখ রয়েছে—জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা মহাশয় শিক্ষা দিয়েছেন, বৌদ্ধধর্মের সাধনার মূল ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো “জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকে অতিক্রম করা।”

তাইলে, “অতিক্রম করা” বলতে কী বোঝায়? আমার মনে হয়, এর অর্থ দুঃখকে সম্পূর্ণ দূর করে দেওয়া নয়; বরং এই চার প্রকার দুঃখকে সঙ্গে নিয়েই কীভাবে জীবনযাপন করতে হয়, সেই পথ খুঁজে বের করা।

জন্মদুঃখ হলো এমন এক জীবনের বাস্তবতা, যেখানে সবকিছু আমাদের ইচ্ছা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী ঘটে না। কিন্তু আমরা জন্মগ্রহণ করেছি বলেই বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি এবং অসংখ্য সম্পর্ক ও আত্মিক বন্ধন লাভ করি। সেই অর্থে, বেঁচে থাকা মানে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ও কর্মবন্ধনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলার এক যাত্রা।

জরাদুঃখ হলো শরীরের ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়া এবং শক্তি-সামর্থ্য হ্রাস পাওয়া। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অভিজ্ঞতাও বৃদ্ধি পায়। আমরা অন্যের দুঃখ-কষ্ট আরও গভীরভাবে বুঝতে শিখি এবং তাদের প্রতি সহমর্মী হয়ে উঠতে পারি।

ব্যাধিদুঃখ-ও অত্যন্ত বেদনাদায়ক ও কষ্টকর। কিন্তু অসুস্থতার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই আমরা সুস্থ থাকার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করতে পারি। পাশাপাশি, আমাদের চারপাশের মানুষ যেভাবে পাশে দাঁড়ান ও সহযোগিতা করেন, সেই ভালোবাসা ও সহমর্মিতার গুরুত্বও গভীরভাবে অনুভব করতে পারি।

আর সবশেষে রয়েছে মৃত্যুদুঃখ। প্রত্যেক মানুষের জীবনই একদিন অনিবার্যভাবে শেষ হয়ে আসে। কিন্তু একদিন আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে বলেই আজকের এই দিনটিকে আরও মূল্যবান করে তুলতে পারি। জীবনের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করতে পারি বলেই প্রতিটি দিনকে আনন্দ, ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বাঁচার প্রেরণা পাই।

জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু—এই চার প্রকার দুঃখকে আমরা সম্পূর্ণভাবে দূর করতে পারি না। কিন্তু এই দুঃখগুলোর মধ্য দিয়েই জীবনের অমূল্যতা উপলব্ধি করতে পারি এবং অন্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক ও আত্মিক বন্ধনগুলোকে আরও যত্নের সঙ্গে লালন করতে শিখি।

এভাবে চিন্তা করলে, চার প্রকার দুঃখ হয়তো জীবনকে যন্ত্রণা দেওয়ার “চারটি দেয়াল” নয়; বরং জীবনকে আরও গভীরভাবে উপলব্ধি ও যাপন করার “চারটি প্রবেশদ্বার”।

আমার বিশ্বাস, “জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুকে অতিক্রম করা” মানে দুঃখহীন জীবনের সন্ধান করা নয়; বরং দুঃখের মধ্যেও জীবনের অর্থ খুঁজে পাওয়া, প্রতিটি অভিজ্ঞতার অন্তর্নিহিত মূল্য উপলব্ধি করা এবং বর্তমান মুহূর্তটিকে পরিপূর্ণভাবে বাঁচতে শেখা।



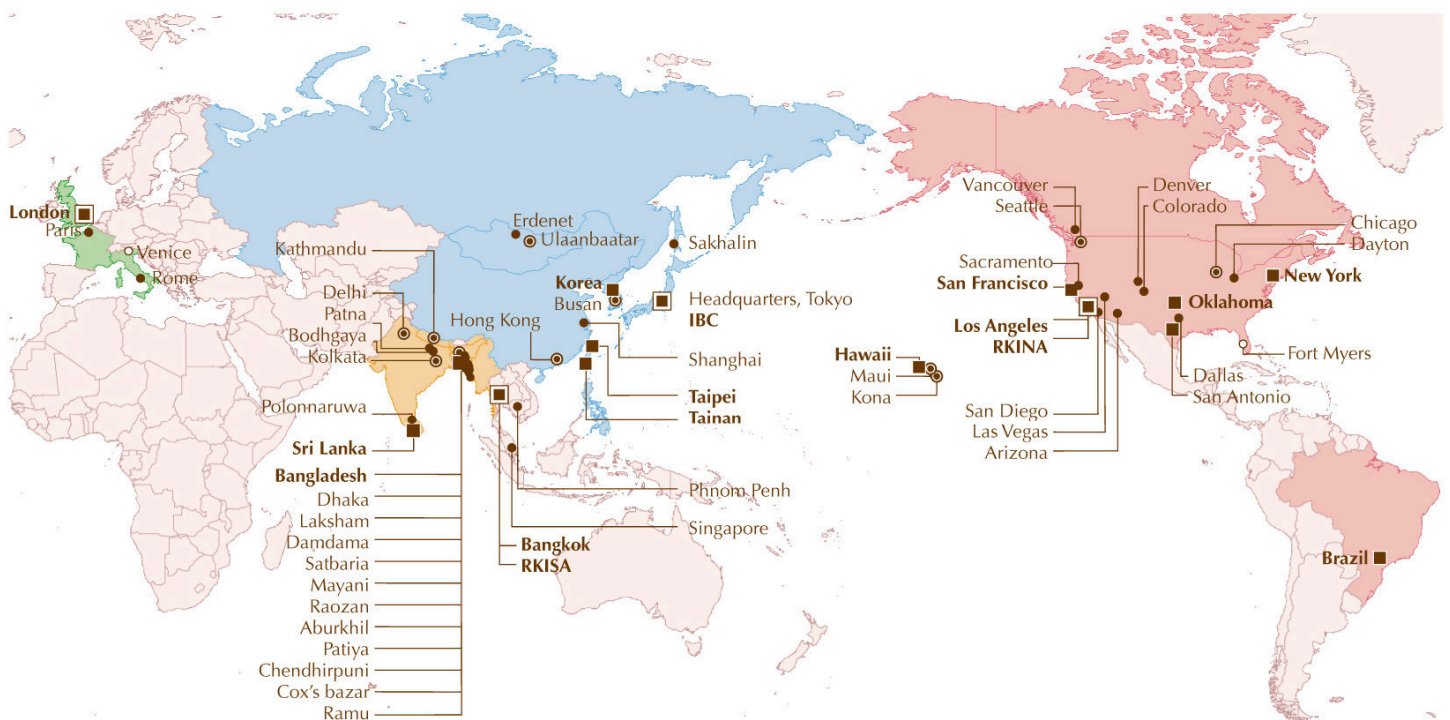
১২ই আগস্ট, লন্ডন সেন্টারের সদস্য মার্টিন টেলর এবং তাঁর স্ত্রীকে আন্তর্জাতিক বিভাগে স্বাগত জানানো হয়। জনাব টেলর স্কটল্যান্ডে বসবাসকারী একজন বিশ্বখ্যাত গিটারবাদক এবং টোকিওতে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে জাপান সফরে এসেছিলেন। বিভাগীয় প্রধান রেভারেন্ড মায়েদা সামনের সারির একেবারে ডানদিকে রয়েছেন।

Rissho Kosei-kai International

Make Every Encounter Matter



🌸 A Global Buddhist Movement 🌸



Information about
local Dharma centers



facebook



X



✉ We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp